বাংলাদেশের বন সংরক্ষণে সহব্যবস্থাপনা ও কর্পোরেট স্বার্থ[১]

মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান

মার্কিন সরকারের প্রতিষ্ঠান ইউএসএআইডির অর্থায়নে বন সংরণের প্রকল্প শুরু হয় ২০০৩ সালে। পরবর্তীকালে এটি 'ইন্টিগ্রেটেড প্রটেকটেড এরিয়াজ কনজার্ভেশন বা আইপ্যাক' (IPAC) (২০০৮-২০১২) নাম ধারণ করে। বর্তমানে 'ক্লাইমেট-রিজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেম অ্যান্ড লাইভলিহুড' বা ক্রেল (CREL) (২০১৩-২০১৮) নামে এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের মোট ৩৫টির মধ্যে ২৫টি জলাভূমি ও বনভূমি সংরক্ষণে পরিচালিত হচ্ছে। সহব্যবস্থাপনা কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে এই প্রকৃতি/বন সংরক্ষণ প্রকল্প। আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিপরীত স্বার্থধর্মী রাষ্ট্র ও অরাষ্ট্রীয় সংগঠনের অংশগ্রহণ প্রকৃতি/বন সংরক্ষণে আসলেই কতটুকু কার্যকর? নাকি এই সহব্যবস্থাপনা কাঠামোর মধ্য দিয়ে সর্বজনের পরিবেশ/প্রকৃতি এখন গুটিকয়েক দেশি-বিদেশি কোম্পানি/সংস্থা/এনজিওর একচেটিয়া আধিপত্যের শিকার? এই গবেষণাভিত্তিক লেখা এসব প্রশ্নের উত্তরই অনুসন্ধান করছে।

পরিবেশবিষয়ক সচেতনতা এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশবিজ্ঞান জনপ্রিয় হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের মতো প্রান্তস্থ দেশের পরিবেশগত জাতীয় নীতি প্রণয়নে আইইউসিএন (IUCN)-এর মতো পরিবেশগত বিশ্ব সংগঠনের অংশগ্রহণও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এর সাথে সাথে জাতীয় পর্যায়ে দেশীয় এনজিওদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। এটা সম্ভব হয়েছে বিংশ শতকে প্রকৃতি/বন সংরক্ষণ কার্যক্রমে সহব্যবস্থাপনা বা কো-ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রচলনের মধ্য দিয়ে (বরিনি-ফায়েরবন্দ ও অন্যান্যরা, ২০০০)। আর এই তাত্ত্বিক ধারণাকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছে আইইউসিএনসহ ইউএসএআইডি (USAID), ডিএফআইডি (DFID), বিশ্বব্যাংক প্রভৃতির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো। এই তাত্ত্বিক ধারণার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি/বন সংরক্ষণ প্রকল্পে বিশেষ করে রাষ্ট্র ও অরাষ্ট্রীয় সংগঠন, যেমন– স্থানীয় জনগোষ্ঠী, এনজিও, বিদেশি সংস্থা, দেশীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং এমনকি বহুজাতিক কোম্পানির অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রকাশ ঘটে থাকে পাবলিক-প্রাইভেট ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে। আবার এ রকম কার্যক্রমকে যৌক্তিক করা হয় 'অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র', 'টেকসই উন্নয়ন', 'স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিশ্চিত করা বা কার্যক্রম থেকে শেখার' (Learning by doing) নামে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের সহব্যবস্থাপনার কাঠামোতে আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিপরীত স্বার্থধর্মী এবং বিপরীত মূল্যবোধের রাষ্ট্র ও অরাষ্ট্রীয় সংগঠন, যেমন– খনিজ কোম্পানি এবং পরিবেশগত সংগঠনের অংশগ্রহণ প্রকৃতি/বন সংরক্ষণে আসলেই কতটুকু কার্যকর? নাকি এই সহব্যবস্থাপনা কাঠামোর মধ্য দিয়ে সর্বজনের পরিবেশ/প্রকৃতি এখন গুটিকয়েক দেশি-বিদেশি কোম্পানি/সংস্থা/এনজিওর একচেটিয়া আধিপত্যের শিকার?

বাংলাদেশেও এ ধরনের সহব্যবস্থাপনা কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে একটি প্রকৃতি/বন সংরক্ষণ প্রকল্প। এই লেখাটির উপজীব্য এই প্রকল্পটিই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দাতা প্রতিষ্ঠান ইউএসএআইডির অর্থায়নে বন সংরক্ষণের এই প্রকল্পটি শুরু হয় ২০০৩ সালে। পরবর্তীকালে এটি 'ইন্টিগ্রেটেড প্রটেকটেড এরিয়াজ কনজার্ভেশন বা আইপ্যাক' (IPAC) (২০০৮-২০১২) নাম ধারণ করে। বর্তমানে 'ক্লাইমেট-রিজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেম অ্যান্ড লাইভলিহুড' বা ক্রেল (CREL) (২০১৩-২০১৮) নামে এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের মোট ৩৫টির মধ্যে ২৫টি জলাভূমি ও বনভূমি সংরক্ষণেই পরিচালিত হচ্ছে।

শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চেমোনিকস ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেটেড ২০০০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটির সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং একটি ১৮ বছরব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি নকশা প্রণয়ন করেছিল (চেমোনিকস ইন্টারন্যাশনাল, ২০০১)। নিসর্গ প্রকল্পটির প্রধান পরামর্শ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিসোর্সেস গ্রুপ বা আইআরজি (IRG)। সাথে ছিল আইইউসিএনের বাংলাদেশ অফিস। আর এই প্রকল্পটির বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছিল এদেশীয় বিভিন্ন পরিবেশগত/পরিবেশভিত্তিক এনজিও, যেমন– নেচার কনজার্ভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বা ন্যাকম (NACOM), ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অব বাংলাদেশ বা ডাব্লিউটিবি (WTB), কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বা কোডেক (CODEC), সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ বা সিএনআরএস (CNRS) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বা বেলা (BELA)।

শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চেমোনিকস ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেটেড ২০০০-০৩ সাল নাগাদ প্রকল্পটির সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং একটি ১৮ বছরব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি নকশা প্রণয়ন করেছিল। নিসর্গ প্রকল্পটির প্রধান পরামর্শ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিসোর্সেস গ্রুপ বা আইআরজি (IRG)। সাথে ছিল আইইউসিএনের বাংলাদেশ অফিস।

বলে রাখা ভালো, নিসর্গ প্রকল্পের আওতায় শুরুতে লাউয়াছড়া, রেমা-কালেঙ্গা, সাতছড়ি, চুনতি, টেকনাফকে পাইলট স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই পাঁচটি স্থানই ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে কর্তৃক ২০০১ সালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি খনিজ গ্যাসসমৃদ্ধ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল অঞ্চলে অবস্থিত, যা 'চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা ফোল্ড বেল্ট' নামে পরিচিত। ২০০৮ সালে, শ্রীমঙ্গলে এই নিসর্গ প্রকল্পের সময়কালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি শেভরন বাংলাদেশের নিজস্ব বন আইন ভঙ্গ করে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং বন অধিদপ্তরসহ সকলকে উপেক্ষা করে লাউয়াছড়া নামের সংরক্ষিত বনের খনিতে গ্যাসের সম্ভাব্যতা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ-ঝুঁকিপূর্ণ ত্রিমাত্রিক সিসমিক জরিপ করেছিল।

মজার ব্যাপার হলো, জাতীয় পর্যায়ে নিসর্গ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী এই সব পরিবেশবাদী এনজিওগুলি আইইউসিএন বাংলাদেশের নিজস্ব জাতীয় কমিটির সদস্য। আবার চেমোনিকস ইন্টারন্যাশনাল নিসর্গ প্রকল্প প্রচলনে পরামর্শকের সফল দায়িত্ব পালনের পুরস্কার হিসেবে পরবর্তীতে ইউএসএআইডির সাথে পাবলিক-প্রাইভেট ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় এবং বাংলাদেশে 'সূর্যের হাসি' প্রকল্প চালু করে। 'সিমেক্স সিমেন্ট', 'গ্রামীণফোন' ও 'ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো'র সাথে শেভরনও ইউএসএআইডির এই প্রকল্পে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্য প্রদান করে। সেই সাথে ওই অঞ্চলে শেভরনের গ্যাস উত্তোলন চলতে থাকে। সূর্যের হাসি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো চেমোনিকস ইন্টারন্যাশনাল ও শেভরন প্রকাশ্য আন্তসম্পর্কে যুক্ত হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, ইউএসএআইডি ও আইইউসিএন বাংলাদেশের আন্তসম্পর্কের ভিত্তি কি শুধুই পরিবেশকেন্দ্রিক, নাকি এর সাথে অন্য কোনো হীনস্বার্থ জড়িত? ১৩ ও ১৪ নং গ্যাস ব্লক উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত মার্কিন কোম্পানি শেভরনের এই প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্ক কী? এ ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ বিভাগের ভূমিকাই বা কী ছিল?

এই লেখাটিতে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হবে বাংলাদেশে বাস্তবায়নাধীন নিসর্গ প্রকল্প (২০০৩-০৮) সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটনাপ্রবাহে আলোকপাত করার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে মূল আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। একটি হলো সিসমিক জরিপ এবং অপরটি আইইউসিএন বাংলাদেশের সাথে গড়ে ওঠা শেভরনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক গবেষণায় মূলত নির্ভর করতে হয়েছে সিসমিক জরিপ সংক্রান্ত এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিল-দস্তাবেজ, প্রতিবেদন এবং এ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ২০০৭-০৮ সালে আদান-প্রদানকৃত অফিশিয়াল ই-মেইলগুলোর ওপর। এ লেখাটিতে এই ই-মেইলগুলোর কিছু প্রাসঙ্গিক নমুনা ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র।

> ২০০৮ সালে, শ্রীমঙ্গলে এই নিসর্গ প্রকল্পের সময়কালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি শেভরন বাংলাদেশের নিজস্ব বন আইন ভঙ্গ করে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং বন অধিদপ্তরসহ সকলকে উপেক্ষা করে লাউয়াছড়া নামের সংরক্ষিত বনের খনিতে গ্যাসের সম্ভাব্যতা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ-ঝুঁকিপূর্ণ ত্রিমাত্রিক সিসমিক জরিপ করেছিল।

বলে নেওয়া ভালো, আইইউসিএন বাংলাদেশের সাথে গ্যাস-তেল কোম্পানি শেভরনের ব্যবসায়িক লেনদেনের সম্পর্ক হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। এটা হয়েছে দুই ধাপে: ত্রিমাত্রিক সিসমিক জরিপের আগে ও পরে। প্রথম ধাপে আইইউসিএন বাংলাদেশ সরাসরি শেভরনের পক্ষে কাজ করেনি। শুরুতে সিসমিক জরিপের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন বা ইআইএ (EIA) মূল্যায়নের কাজটি করেছে আইইউসিএন বাংলাদেশ। এই কাজের জন্য শেভরন কর্তৃক ২০০৭ সাল থেকে নিযুক্ত ঠিকাদার 'স্লোয়ি মাউন্টেনস ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন' বা স্মেকের (SMEC) সাথে একই সময়ে চুক্তিবদ্ধ উপ-ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইইউসিএন বাংলাদেশও চুক্তিবদ্ধ হয়। এই ইআইএর ভিত্তিতেই পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে শেভরন কিছু শর্তের ভিত্তিতে পরিবেশ ছাড়পত্র পায়। এখানে আইইউসিএনকে সিসমিক জরিপের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদানের কথা বলা হয়। এই শর্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় ধাপে শেভরনের অর্থায়নে আইইউসিএন লাউয়াছড়া বনে সরাসরি দায়িত্ব পালন করেছে ২০০৮ সালের সিসমিক জরিপের ফলে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ দলের প্রধান হিসেবে। এই পর্যবেক্ষণ শেষে আইইউসিএন বাংলাদেশ একটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনও জনসমক্ষে প্রকাশ করে।

প্রকল্পটির সূচনা প্রক্রিয়া

২০০০ সালের মার্চ মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় জলাভূমি ও বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কাজে বাংলাদেশের ৬ মিলিয়ন ডলারের অপরিশোধিত ঋণ মওকুফ করার ঘোষণা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রপিক্যাল ফরেস্ট কনজার্ভেশন অ্যাক্ট (TCFA) ১৯৯৮'-এর অধীনে একটি 'ট্রপিক্যাল ফরেস্ট কনজার্ভেশন ফান্ড' তৈরি করা হয়। এই ফান্ড কাজে লাগাতে ইউএসএআইডি বাংলাদেশ সরকারের সাথে দশ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। বন বিভাগ এবং ইউএসএআইডি যৌথভাবে গাজীপুরের ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্কে নিসর্গ প্রকল্প শুরু করে। প্রকল্পটি মূলত ইউএসএআইডির কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় বন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে চালু হয়। এই প্রকল্পটি চালু করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থ সচিবের সাথে ইউএসএআইডির মিশন পরিচালকের মধ্যে 'স্ট্র্যাটেজিক অবজেক্টিভ গ্র্যান্ড অ্যাগ্রিমেন্ট' (SOAG) নামের একটি চুক্তি সই হয় ২০০৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট 'প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার' এবং 'প্রজেক্ট প্রপোজাল' পরিকল্পনা কমিশনে জমা পড়ে প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর। এমনকি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নীতিমালাকেন্দ্রিক পরামর্শ প্রদানের জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় প্রকল্পটির অফিশিয়াল কার্যক্রম শুরুর পর। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, সর্বসম্মতভাবে গৃহীত স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত মানদন্ড অনুসরণ না করেই প্রোগ্রাম ডিজাইন পেপারে লাউয়াছড়া ন্যাশনাল পার্ক, রেমা-কালেঙ্গা অভয়ারণ্য, সাতছড়ি রিজার্ভ ফরেস্ট এবং টেকনাফ গেম রিজার্ভ– এই চারটি অঞ্চলের নাম উঠে আসে। পরবর্তীতে চুনতির নাম যুক্ত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণকেই গুরুত্ব দিলে তো এমনটি হওয়ার কথা নয়। অবশ্য এই বিশেষ অঞ্চলগুলোর মাটির নিচের খনিজ সম্পদের ওপর নজর থাকলে ভিন্ন কথা। এই প্রতিটি ছোট ছোট ঘটনা একসাথে জোড়া লাগালে সামগ্রিকভাবে যে চিত্রটি উঠে আসে, তাতে এই দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীর গোপন অভিপ্রায় প্রকাশের আর কিছু বাকি থাকে না।

লাউয়াছড়াসংলগ্ন ভানুগাছ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চেমোনিকস ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেশন ইউএসএআইডির পরামর্শক হিসেবে কাজ শুরু করে ২০০০ সালেই। চেমোনিকস ইন্টারন্যাশনালের একটি পরামর্শক দল লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের উত্তরে অবস্থিত পশ্চিমাঞ্চলীয় ভানুগাছ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ২৮১ হেক্টর জায়গা এবং সেই সাথে সাতছড়িসহ এই 'সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে' 'জাতীয় উদ্যান' শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ করে বন বিভাগকে। এর উদ্দেশ্য ছিল অতিরিক্ত ২৮১ হেক্টর জায়গাকে সিসমিক জরিপ প্রকল্প এলাকার আওতাভুক্ত করে তাদের অনুসন্ধান কাজের পরিধি বাড়িয়ে নেওয়া। আর এ ক্ষেত্রে বনের শ্রেণি পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের কাজের আইনি বৈধতা নিশ্চিত করার অন্য উপায় ছিল না। কারণ বন আইন অনুসারে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গাছপালা-প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংসকারী কোনো ধরনের সমীক্ষা অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পূর্ণ বেআইনি। 'জাতীয় উদ্যান' শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্তির ফলে

ভানুগাছ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ওই অংশে উন্নয়নের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক কার্যাবলি সম্পাদনের ব্যাপারটি আইনি বৈধতা পায় এবং উদ্যানের ভেতর রাস্তাঘাট, বাংলো, হোটেল নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়, যা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে পরিবেশ অধিদপ্তরও আর আপত্তি তোলেনি ওই সংরক্ষিত এলাকায় সিসমিক জরিপের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ শুরু করার ব্যাপারে।

ত্রিমাত্রিক সিসমিক জরিপ এবং নিসর্গ প্রকল্প কাঠামো

নিসর্গ প্রকল্পের শুরুতে নানা প্রচার-প্রচারণায় 'অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে' 'পরিবেশ সংরক্ষণ', 'সম্পদের টেকসই ব্যবহার', 'স্থানীয় উন্নয়ন'সহ আরো নানান ঝকমারি কথার কোনো কমতি ছিল না। ২৫ মে ২০০৬ সালে একটি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বন বিভাগসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাকারীদের সাথে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৫-১৯ সদস্যের সহব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ৫৫ সদস্যের সহব্যবস্থাপনা কাউন্সিল গঠনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। এ দুই স্তরের কাঠামোটিই নিসর্গ প্রকল্পের অন্তর্গত বনাঞ্চল রক্ষার জন্য বিধিবদ্ধভাবে 'বনের রক্ষাকারী' হিসেবে কাজ করার কথা ছিল। এটি বন সংরক্ষণ, দেখভাল এবং যে কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য দায়বদ্ধ ছিল। এখানে উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে পরিচালিত ত্রিমাত্রিক সিসমিক জরিপটির ব্যাপারে বিভাগীয় বন কর্মকতার বরাতে বলা হয়, শেভরনের এই জরিপ পরিচালনার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল। অথচ ঢাকায় বন বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং জ্বালানি মন্ত্রণালয় এই প্রক্রিয়া শুরু করে ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে। সেই সময় শেভরন পরিবেশ অধিদপ্তরে অবস্থানগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করে। সেই সাথে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সাথেও বৈঠক করে। ২০০৭ সালের ২৪ অক্টোবর পরিবেশ অধিদপ্তর শেভরনকে মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য অবকাঠামো নির্মাণের সুযোগ দেয়। একই বছরের নভেম্বর মাসে শেভরন অবস্থানগত ছাড়পত্রও জোগাড় করে ফেলে। আর সব শেষে শেভরন ২০০৮ সালে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে জরিপের কাজ শুরু করে। বন ও পরিবেশবিধ্বংসী এই অনুসন্ধান কাজের সমালোচনা করে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচারিত হলে মৌলভীবাজার বন বিভাগ আশঙ্কা ব্যক্ত করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি প্রেরণ করে। অথচ পরিবেশ মন্ত্রণালয় সেই চিঠি গ্রাহ্য তো করেইনি, বরং আইনি কাঠামোয় পরিবর্তন এনে শেভরনের এই কাজকে বৈধতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা শুরু করে। পরিশেষে একটি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে শেভরনের বেআইনি কার্যক্রমকে জনস্বার্থের অজুহাতে আইনি বৈধতাও দেওয়া হয়। অনুমোদন না নিয়েই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ সার্ভে শুরু করে দেওয়া, ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর অনুমোদন পেতে প্রভাব খাটিয়ে আইনি কাঠামোয় পরিবর্তন আনাসহ নানা নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে শেভরন ২০০৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পরিবেশগত ছাড়পত্র আদায় করে। অথচ ২০০৮ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত সিসমিক জরিপ পরিচালনার ব্যাপারে স্থানীয় সহব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো অফিশিয়াল অবস্থান ছিল না। যখন বনের দেখভালকারী এই কমিটি শেভরনের পরিচালিত সিসমিক জরিপকে পরিবেশের প্রতি হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে আনুষ্ঠানিক চিঠি প্রেরণ করে, তত দিনে শেভরনের সার্ভে প্রায় শেষ।

২০০৮ সালে পরিচালিত ত্রিমাত্রিক সিসমিক জরিপটির ব্যাপারে বিভাগীয় বন কর্মকতার বরাতে বলা হয়, শেভরনের এই জরিপ পরিচালনার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল। অথচ ঢাকায় বন বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং জ্বালানি মন্ত্রণালয় এই প্রক্রিয়া শুরু করে ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে।

বেলা (BELA) এবং ডাব্লিউটিবি (WTB) নিসর্গ প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিল। এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে নিসর্গ প্রকল্পের সহব্যবস্থাপনা কাঠামোকেন্দ্রিক কার্যক্রমকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ২০০৭ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে (১৯৭৪) পরিবর্তন আনা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বেলা পরামর্শক হিসেবে কাজ করছিল। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বা বেলার প্রধান ২০০৮ সালের জুন মাসে লেখক কর্তৃক নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই সিসমিক জরিপের জন্য শুধুমাত্র সরকারকে দায়ী করেন (খান, ২০১০)। পরিবেশসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে জনস্বার্থে বিভিন্ন প্রকল্পের বিরুদ্ধে বেলার মামলা বা আইনি নোটিশ দেওয়ার নজির থাকলেও সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ জরিপ পরিচালনার বিপরীতে তাদেরকে এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। বরং ওই সাক্ষাৎকারে শেভরনের বিরুদ্ধে কোনো রকম আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার যুক্তি হিসেবে দেখানো হয় এ ধরনের মামলায় হেরে যাওয়ার আশঙ্কাকে। তবে বেলার শ্রীমঙ্গল অফিস শেভরনের জরিপের বিরুদ্ধে মানববন্ধনের মাধ্যমে প্রতিবাদ করে।

ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন এবং আইইউসিএন

একটি পরিবেশ সংগঠনের সাথে গ্যাস-তেল-খনিজ কোম্পানির ব্যবসায়িক সম্পর্ক কী ধরনের ফলাফল বয়ে আনে তা সিসমিক জরিপের ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে চোখ বোলালেই টের পাওয়া যায়। শেভরনের সাথে আইইউসিএন বাংলাদেশের এই 'লাভজনক' সম্পর্ক রক্ষা করতেই অন্য অনেকের মতো তাদের চোখেও লাউয়াছড়া বনে সিসমিক জরিপের ফলে সৃষ্ট কোনো প্রতিবেশগত ক্ষতি ধরা পড়েনি। উপরন্তু মিডিয়াতে শেভরনের পক্ষে তারা ঢালাও সাফাই গাইতে থাকে। এ ক্ষেত্রে আইইউসিএনের বাংলাদেশ অফিস কর্তৃক প্রণীত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের নির্বাহী সারসংক্ষেপের (Executive Summary) শেষের অংশটি সবচেয়ে চমকপ্রদ। এতে স্বাভাবিকভাবেই তারা দাবি করে :

পর্যবেক্ষণের ফলাফল বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে [সিসমিক জরিপ] প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজের ফলে বন্যপ্রাণীর সংখ্যার ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন পাওয়া যায়নি। ড্রিলিং করে গর্ত করার ফলে ছোট কিছু লতা-গুল্ম সরাতে হয়েছে। কিন্তু কোনো গাছ বা সংকটাপন্ন কোনো উদ্ভিদ এই ত্রিমাত্রিক জরিপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। প্রকল্প পরবর্তী অবস্থায় মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলো আবার আগের মতো হয়ে উঠতে শুরু করেছে (আইইউসিএন, ২০০৮: ৮)।

শেভরনের ভাবমূর্তি বাঁচাতে আইইউসিএনের এই প্রতিবেদনটি কতটুকু নিরপেক্ষভাবে করা হয়েছে তা বুঝতে তাদের সম্পর্কের ধরন ও পর্যবেক্ষণ দল গঠনের প্রক্রিয়াটা বোঝা জরুরি।

পর্যবেক্ষণ দল গঠনের জন্য আইইউসিএন বাংলাদেশ অফিসের ব্যাংককস্থ তাদের আঞ্চলিক অফিস থেকে অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। পর্যবেক্ষণ দল গঠনের জন্য আইইউসিএনের বাংলাদেশ অফিসের প্রয়োজন ছিল তাদের ব্যাংককস্থ আঞ্চলিক অফিসের অনুমোদন নেওয়া। এই প্রক্রিয়াটি একটু সময়সাপেক্ষ ছিল। অন্যদিকে শেভরন ২০০৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই জরিপের কাজ শুরু করতে চাইছিল। তাই আইইউসিএন বাংলাদেশ অফিস দ্রুত অনুমোদন পাওয়ার জন্য আঞ্চলিক অফিসকে একটি অধিক মনোযোগ আকর্ষণী ই-মেইল পাঠায়[২]। তাতে তারা জানায় :

শেভরন বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে একটি ত্রিমাত্রিক জরিপ কাজ পরিচালনার পরিকল্পনা করছে। তাদের জরিপের জন্য নির্দিষ্ট করা সীমার মধ্যে দুঃখজনকভাবে প্রাণিবৈচিত্র্যসম্পন্ন বাংলাদেশের অন্যতম গুরুতপূর্ণ একটি বনাঞ্চল রয়েছে। শেভরন ইআইএ তৈরি করার জন্য স্মেককে দায়িত্ব প্রদান করেছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরে জমা দেওয়া ইআইএ (EIA)টিকে সবুজ সংকেত দেওয়ার ব্যাপারে বন অধিদপ্তর আগ্রহী নয়। বন অধিদপ্তরের অনুরোধে পরিবেশ অধিদপ্তর একটি নোটিশ জারি করে যেখানে বলা হয়, প্রকল্পটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন অধিদপ্তর, আইইউসিএন এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে একটি পর্যবেক্ষণ (monitoring) দল গঠন করতে হবে, যা জরিপ চলার সময়ে বনাঞ্চলের ওপর এর প্রভাব কমিয়ে রাখা নিশ্চিত করবে।

আঞ্চলিক অফিসকে আরো আগ্রহী করে তুলতে আইইউসিএন একই ই-মেইলে জানায় যে জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে সরকারের উপরমহল থেকে শেভরন ইতিমধ্যেই পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। বলাই বাহুল্য, এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য। কেননা প্রথমত ই-মেইলটি পাঠানো হয় ২০০৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আর পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র ইস্যু করে ঠিক এর পরের দিন অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি। শেভরনকে তা পাঠানো হয় ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে।

ওই ই-মেইলেই[৩] আইইউসিএন বাংলাদেশ অফিস শেভরনের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক লাভালাভের বিষয়টি খোলামেলাভাবেই উল্লেখ করে। এতে বলা হয় :

মাত্র ৩ মাসব্যাপী [পরিবেশগত] পর্যবেক্ষণ কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ আছে এক লাখ ডলার। আমরা মনে করি, ব্যবসা এবং [বন] সংরক্ষণ যে একই সাথে চলতে পারে, তা প্রমাণ করার এটিই একটি মোক্ষম সুযোগ। আমি শেভরন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি, তারা ভবিষ্যৎ প্রচারণামূলক কাজের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ রাখতে সম্মত হয়েছে। আমি এ বিষয়ে তাদের বহিঃসম্পর্ক বিভাগের (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বা সিএসআর বিষয় সম্পর্কিত) সাথেও কথা বলেছি। তারা আইইউসিএন-শেভরন সম্পর্কটিকে পরবর্তী সময়েও আরো এগিয়ে নিতে চান।

আবার সিসমিক জরিপের ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ দলে অংশগ্রহণকারী আইইউসিএন বাংলাদেশের একজন অফিসার তাঁদের এক কর্তাব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি করে কাজ এগিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আরেকটি ই-মেইলে লেখেন[৪]:

শেভরনকে আগামীকালের মধ্যেই আমাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে...এক লাখ বিশ হাজার ডলার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, সাথে রয়েছে মাত্র তিন মাসে ২৫ হাজার ডলার নগদ কামাইয়ের সুযোগ...মার্চ-মে ০৮...তাড়াতাড়ি করুন...।

এই ই-মেইলগুলো থেকেই বোঝা যায় যে 'পরিবেশ ব্যবসা'য় এমন মোটা অঙ্কের প্রাপ্তিযোগ থাকলে 'কারিগরি উপদেষ্টা', 'নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানকারী' ইত্যাদি নানা তকমায় আইইউসিএনকে সহজেই অংশীদার হিসেবে পাওয়া যায় এবং এই পরিবেশগত সংগঠনটি আর্থিক লাভের ব্যাপারে সব সময়ই উৎসুক হয়ে থাকার পাশাপাশি সকলের সামনে তাদের নিরীহ মুখোশটি অক্ষুণ্ন রাখতে বেশ তৎপর থাকে। আইইউসিএন বাংলাদেশের উর্ধ্বতন এক কর্তাব্যক্তির তাঁর অধস্তন একজনকে লেখা ই-মেইল থেকে অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কেও এ রকম কিছুটা আঁচ সম্পর্কে আরো নিশ্চিত হওয়া যায়:[৫]

এই ই-মেইলগুলো থেকেই বোঝা যায় যে 'পরিবেশ ব্যবসা'য় এমন মোটা অঙ্কের প্রাপ্তিযোগ থাকলে 'কারিগরি উপদেষ্টা', 'নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানকারী' ইত্যাদি নানা তকমায় আইইউসিএনকে সহজেই অংশীদার হিসেবে পাওয়া যায় এবং এই পরিবেশগত সংগঠনটি আর্থিক লাভের ব্যাপারে সব সময়ই উৎসুক হয়ে থাকার পাশাপাশি সকলের সামনে তাদের নিরীহ মুখোশটি ক্ষুণ্ন রাখতে বেশ তৎপর থাকে।

শেভরনের সাথে এযাবৎ হওয়া সকল যোগাযোগের কপি প্রিন্ট করে একটি ফাইলে গুছিয়ে রাখুন। আমরা যে সকল পরামর্শ মেনে চলেছি তা প্রমাণ করতে এটি কাজে লাগতে পারে। এখন থেকে টাঙ্গুয়ার হাওর প্রকল্প এবং আন্তসীমান্ত পানি প্রকল্পকে ঘিরে অনেক যোগাযোগ তৈরি হবে। দুটোর সাথেই বড় অঙ্কের টাকা জড়িত। তাই এ দুটি প্রস্তাবে অনেক আগ্রহ থাকবে। অনেক প্রশ্নও উঠবে, সেই সাথে নিতে হবে অনেক সিদ্ধান্ত। এমন অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, যেগুলোর তাৎক্ষণিক অনুমোদন পাওয়া যাবে না। এমন অনেক পরামর্শ আসবে, যেগুলোর বেশির ভাগই হয়তো বা পালন করা সম্ভব হবে না।

স্মেকের সাথে দাসখতের চুক্তি এবং এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানসহ পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন

লাউয়াছড়া উদ্যানে প্রারম্ভিক পরিবেশগত পরীক্ষা বা আইইই (IEE) এবং পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন বা ইআইএ (EIA) পুনর্নিরীক্ষণের জন্য শেভরনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ স্মেকের সাথে আইইউসিএন বাংলাদেশের যে উপ-ঠিকাদারির (subconsultancy) চুক্তি হয় ২০০৭ সালে[৬], তার একটা অদ্ভুত শর্ত ছিল। এই চুক্তিটিতে বলা হয় :

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকে স্মেকের স্বার্থরক্ষায় সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে।...স্মেকের স্বার্থ ব্যাঘাতকারী কোনো কাজে [দুই পক্ষের] কেউ যুক্ত হবে না।

এ রকম দাসখত দেওয়া উপ-ঠিকাদারি চুক্তির মাধ্যমে শেভরনের সাথে আইইউসিএন পরোক্ষভাবে যে ব্যবসায়িক 'লাভজনক' সম্পর্কে যুক্ত হয়, তার বাইরে এসে পরবর্তী সময়ে পরিবেশের স্বার্থে শেভরনের কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করার কোনো রকম সুযোগ তাদের ছিল না। এই দাসখতের প্রতিফলন এই চুক্তির আওতায় আইইউসিএন বাংলাদেশের কার্যক্রমে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্মেকের পরামর্শে এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (EMP) পুনর্নিরীক্ষণ করার জন্য আইইউসিএন বাংলাদেশ অফিস 'এনভায়রনমেন্টাল কনজার্ভেশন ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি' বা ইকোম্যাক (ECOMAC)-কে দায়িত্ব প্রদান করে। স্মেকের পরামর্শে ইকোম্যাক দ্বারা পরিবর্তিত হতে থাকা 'ম্যানেজমেন্টে'র ব্যাপারে আইইউসিএন বাংলাদেশ কোনো প্রশ্ন তোলেনি। বরং শেভরনের বাংলাদেশ ব্যবসায়িক এজেন্ট স্মেক আইইউসিএন বাংলাদেশকে ব্যবহার করে সুবিধামতো প্রতিবেদন তৈরি করিয়ে নিচ্ছিল। এ ক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানসহ ইআইএর পুনর্নিরীক্ষণসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রসঙ্গে আলোচনায় আইইউসিএন বাংলাদেশ নিজেও চরম বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। এই বিশ্বস্ততার নমুনা পাওয়া যাবে তাদের তিনটি ই-মেইল যোগাযোগের মধ্যে।

প্রথম ই-মেইলে আইইউসিএন বাংলাদেশ স্মেককে পুনর্নিরীক্ষণসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রসঙ্গে নিশ্চিত করছে এ রকম ই-মেইল কথোপকথনে[৭]:

আমি আপনার দেওয়া মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করে আমাদের [প্রতিবেদনের]

পরিবর্তিত খসড়াটি পাঠাচ্ছি। মাত্রই ফোনে আপনি যে বিষয়গুলো বললেন তা এখানে মন্তব্য আকারে উল্লেখ করুন।

একই দিনে আইইউসিএন বাংলাদেশকে স্মেকের পাঠানো উত্তর[৮]:

আমাদের প্রস্তাবিত পরিবর্তন সংযোজিত প্রতিবেদনে দেখে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি পুরো রিপোর্টটি পড়েছি এবং আপনার করা সবগুলো পরিবর্তন গ্রহণ করেছি। আমি এর সাথে কিছু বাড়তি পরিবর্তন যোগ করলাম। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আপনার সাথে ফোনে কথা হয়েছে। নতুন পরিবর্তিত অংশগুলো চিহ্নিত করা আছে।

সব কিছু 'প্রয়োজনমতো ঠিকঠাক' করার পর আইইউসিএন বাংলাদেশ স্মেকের কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। এ ব্যাপারে আইইউসিএন বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা স্মেকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ওই দিনই ই-মেইলে লেখেন[৯]:

আপনার মন্তব্যগুলো যুক্ত করে প্রতিবেদনটির খসড়া কপিটি পাঠালাম। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমি বিশেষ কিছু পরিবর্তন করিনি। শুধুমাত্র একটি উপসংহার যোগ করেছি। আপনি কি দয়া করে রিপোর্টটি পড়ে জানাবেন যে সবকিছু ঠিক আছে কি না?

শুধুমাত্র পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধনই নয়, বরং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে শেভরনের খনিজ সম্পদ উত্তোলন বাধাগ্রস্ত করতে পারে এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের এমন কিছু বিষয়, স্মেক সম্পাদন করে মূল পুনর্নিরীক্ষণ প্রতিবেদনটি থেকে বাদ দেয়। সম্পাদনার আগের অংশটি ছিল এ রকম :

পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত দেখভালকারীকে পরিবেশ নীতিমালার পরিপন্থী কোনো ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর যদি কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তবে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যে কেউ বন বিভাগ বা আইইউসিএনের নিকট সরাসরি অভিযোগ দায়ের করতে পারবে (আইইউসিএন বাংলাদেশ, ২০০৭ঃ ৯)

পরিশেষ

নিসর্গ/আইপ্যাক প্রকল্প ২০১৩ সালে শেষ হয়ে গেলেও প্রকৃতি/বন সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীর অর্থপ্রাপ্তির আশা শেষ হয়ে যায়নি। পরিবেশ রক্ষায় সরকার এবং এনজিওগুলোর আন্তসম্পর্ক রক্ষা করে ক্রেল এখন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে 'আরণ্যক ফাউন্ডেশনের' মাধ্যমে। তার মানে আইইউসিএন এবং তার অংশীদারদের মতো আপাত দৃষ্টিতে পরিবেশবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাণ-প্রকৃতি-মানুষের স্বার্থ রক্ষার কথা বলে নগদ লাভের চাওয়া-পাওয়ায় বিলীন হওয়ার প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকবে। চলতে থাকবে সরকার কর্তৃক পরিবেশ উন্নয়নের নামে ইউএসএআইডির মতো সাম্রাজ্যবাদী 'দাতা' প্রতিষ্ঠানগুলোর আধিপত্য এবং প্রকৃতি/বন সংরক্ষণের আড়ালে প্রাণ-প্রতিবেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের বৈধতাদান। এই ধরনের প্রকল্পে বেনিয়া গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বার্থ লুকিয়ে থাকে বলে এসব ক্ষেত্রে সহব্যবস্থাপনার বা কো-ম্যানেজমেন্টের ধারণা হয়ে ওঠে একটি নিমিত্তমাত্র, একটি অজুহাতমাত্র। এতে স্পষ্ট হয় যে, তথাকথিত দাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে প্রাণ-প্রতিবেশের চেয়ে তাদের নিজস্ব ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মুনাফার স্বার্থ রক্ষা করার বিষয়টি তাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক, ইউএসএআইডির মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল দেশীয় অথবা আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী এনজিওগুলোরও অনেক ক্ষেত্রেই কোনো স্বাধীন সত্তা থাকে না, শুধুমাত্র তাদের বেনিয়া স্বার্থের ক্রীড়নক হওয়া ছাড়া। তাই পরিবেশ-প্রকৃতি-প্রতিবেশ রক্ষায় এই সব জাতীয়-আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর বেনিয়াবাজি বন্ধে সর্বজনের শক্তির সম্মিলনের কোনো বিকল্প নেই। প্রাণ-প্রকৃতি-মানুষ রক্ষায় সর্বজনের প্রতিরোধই চলমান আগ্রাসন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়।

এ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক, ইউএসএআইডির মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল দেশীয় অথবা আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী এনজিওগুলোরও অনেক ক্ষেত্রেই কোনো স্বাধীন সত্তা থাকে না, শুধুমাত্র তাদের বেনিয়া স্বার্থের ক্রীড়নক হওয়া ছাড়া।

পাদটিকাঃ

১। এই প্রবন্ধটি লেখকের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের একটি অধ্যায়ের আলোকে লেখা। লেখক এই অধ্যায়টির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো অনুবাদের জন্য মওদুদ রহমানের কাছে কৃতজ্ঞ।

২। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সালে এই ই-মেইলটি পাঠানো হয় ঢাকা অফিস থেকে।

৩।পূর্বোক্ত।

৪। ই-মেইলটি পাঠানো হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে।

৫। ই-মেইলটি পাঠানো হয় ১১ মার্চ ২০০৮ তারিখে।

৬। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৫ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে। আর এটি বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯ নভেম্বর ২০০৭-এ।

৭। ই-মেইলটি পাঠানো হয় ৬ ডিসেম্বর তারিখে।

৮। পূর্বোক্ত।

৯। পূর্বোক্ত।

মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান: প্রাবন্ধিক ও গবেষক। সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ই-মেইল: tanzim04@gmail.com

তথ্যসূত্রঃ

[আইইউসিএন বাংলাদেশ] IUCN Bangladesh (2007), "Critical Review of the EMP of Proposed 3-D Seismic Survey of the Moulvi Bazar Gas Field, Final Draft, Submitted to SMEC International", unpublished report. Dhaka: IUCN.

[আইইউসিএন বাংলাদেশ] IUCN Bangladesh (2008), '3-D Seismic Survey at West Bhanughach Reserve Forest by Chevron Bangladesh: Biodiversity Monitoring Report (Final), Vol. I', unpublished report, Dhaka: IUCN.

[খান] Khan, Mohammad Tanzimuddin (2010), The Nishorgo Support Project, the Lawachara National Park, and the Chevron seismic survey: Forest conservation or Energy Procurement in Bangladesh?, Journal of Political Ecology, Vol. 17, pp. 68-78, available at http://jpe.library.arizona.edu/Volume17/Volume_17.html.

[চেমোনিকস ইন্টারন্যাশনাল] Chemonics International (2001), The Bangladesh Tropical Forest Conservation Fund: Preventing and Arresting Accelerating Species Loss in Bangladesh, Task Order under the Biodiversity & Sustainable Forestry IQC (??). USAID Contract No. LAG-I-00-99-000141-00, Task Order 806, Washington: Chemonics International.

[বরিনি-ফায়েরবন্দ ও অন্যান্যরা] Borrini-Feyerbend, Grazia, et al (2000), Co-management of Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning-by-doing, Kasparek Verlag, Heidelberg: GTZ & IUCN.